

“মেধা ক্ষত-বিক্ষত কোটায়”

শাহজাহান আলী মূসা

‘ভাগ কর শাসন কর’ এই ছিল ইংরেজদের মূলমন্ত্র। তারা বিভিন্ন দেশ জয় করত আর তাদের শাসনের নামে শোষণ করত। তাই ইংরেজ খেদাও আন্দোলন কম হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে তারা সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাদের বীজ রেখে গেছে। এখন সেটার অঙ্কুরোদগম হচ্ছে। ইংরেজ বিদায় নিয়েছে ১৯৪৭ সালে কিন্তু তার বিভেদনীতির বীজ রেখে গেছে। যেমন রেখে গেছে উচ্চ আদালতের পোশাক, ভাষা ও রীতিনীতি। তেমনি রেখে গেছে বঙ্কনা ও শোষণের রীতিনীতি যা আজও বিদ্যমান। তখন ছিল ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতি, এখন তা হয়েছে কোটা যার চাকরি তার, ক্ষমতা যার টাকা তার। আর মেধা যেন তেন হলেই চাকরি। আমাদের সরকারি কর্মক্ষেত্রে তো বটেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যা খুবই বেমানান। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সংবিধানেরও লঙ্ঘন বটে। সরকারি চাকরি লাভের ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৯(১) ধারায় বলা হয়েছে যে “প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।” এই সমান সুযোগ এই নয় যে, সবক্ষেত্রে সমান সুযোগ দিতে হবে। কারণ এখানে যারা কর্ম করবে তাদেরকে যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ দিতে হবে, অন্য কোনো পন্থায় নয়। আর যদি অন্য কোনো পন্থায় নিয়োগ করা হয় তাহলে দেশ-আন্তে আন্তে মেধাশূন্যতার দিকে ধাবিত হবে। তখন

মেধাবীরা হতাশ হয়ে বিপথে পা বাড়াবে যা কোনো কারোরই কাম্য নয়।

আজ দেশের শিক্ষিত ও যোগ্য তরুণ সমাজ টুকরা টুকরা হয়ে যাচ্ছে কোটা ব্যবস্থায়। যেমন— মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০,



জেলা কোটা ১০, নারী কোটা ১০, উপজাতি কোটা ৫। তাতে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশই কোটা ব্যবস্থার কারণে টুকরা টুকরা আমাদের শিক্ষিত ও যোগ্য তরুণ সমাজ। একটি মানুষের ৫৫

শতাংশ শরীর যদি আক্রান্ত থাকে তবে সে কি স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারবে? কখনো পারবে না। তেমনি অবস্থা আমাদের শিক্ষিত ও যোগ্য তরুণ সমাজের। দেখা যাচ্ছে, সরকারি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ খালি পড়ে আছে এবং সেগুলো কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে দিয়ে পূরণ করা হচ্ছে। তার ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজকর্ম আন্তে আন্তে স্থবির হয়ে পড়ছে। তাতে কোনো কাজই সঠিক সময়ে হচ্ছে না। এরপর তো দুর্নীতি আছেই। তাই জাতি আজ নানাভাবে ভারাক্রান্ত।

এই ভারাক্রান্ত অবস্থা থেকে জাতি মুক্তি চায়। কোটা নামের মেধাশূন্যতার ও ব্রিটিশ কায়দায় শোষণ থেকে মুক্তি চায়। দেশে যে কটি কোটা ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে নারী ও জেলা কোটা অনতিবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। কারণ নারীরা এখন প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। তারা সহমর্মিতা চায় না, চায় যোগ্য সম্মান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধীদের বড়জোর ২ শতাংশ কোটা রাখা যেতে পারে। আর মুক্তিযোদ্ধা কোটা রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ তারা আমাদের গর্ব। কিন্তু তবুও মুক্তিযোদ্ধা ও উপজাতি কোটায় আলাদা আলাদাভাবে প্রতিযোগিতা রাখা উচিত এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে তাদের সন্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা শ্রেয়।

● লেখক: শিক্ষক, সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা